

রিভার্স মেটামরফোসিস - নব্য দেওবন্দি চিন্তাধারা

মুক্তফা হ্সাইন

মেটামরফোসিস প্রক্রিয়ায় শুয়োপোকা সময়ের সাথে শুয়োপোকা সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু প্রজাপতির মতো সুন্দর প্রাণী যদি শুয়োপোকায় রূপান্তরিত হয় তা কেমন হবে!? নিচয়ই তা হবে এক অনাকঞ্জিত ঘটনা! আর একে রূপান্তর না বলে বিকৃতি বলাই যুক্তিসংগত।

কোনো কিছুর পরিবর্তন মানেই সেটা উন্নতির ইংগিত বহন করে, এমন নয়।

এখন, শতাব্দীব্যাপী ইসলাম, মুসলিম ও মানবজাতির হেফাজতকারীরা যদি পশ্চিমাদের রীতিনীতিই আঁকড়ে ধরে, তবে সেটা কেমন হবে!? আরো একটু ভাবুন—আপসহীন দাওয়াহ, ইস্তিকামাত, ইদাদ, সামরিকায়ন ও আল ওয়ালা ওয়াল বারাআর দীক্ষাদাতারাই যদি পশ্চিমা ভাবাদর্শ, আলোচনার টেবিল, আর কুফফারদের সাথে হৃদ্যতার মানহাজ আঁকড়ে ধরেন, তা কেমন হবে!?

যদি এমন হয়েই থাকে, তাহলে বলতেই হয়, ইসলামের আলেম ও নেতাদের এই রিভার্স মেটামরফোসিস আমাদের জন্য প্রজাপতির শুয়োপোকাতে পরিণত হওয়ার চেয়ে অধিক দুঃখজনক ও বিরুতকর!! তাই উপমহাদেশের নেককার মুসলিম নেতা ও উলামায়ে কেরাম কিভাবে নববী মানহাজ থেকে গণতন্ত্রের বিবর্তন ঘটালেন, তার নির্মোহ বিশ্লেষণ সময়ের দাবী।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সেকুলার মুসলিম লীগ শরীয়াহ শাসিত ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করেনি। বরং উপমহাদেশের একটি নির্দিষ্ট অংশে পশ্চিমা আদর্শের সেকুলার রাষ্ট্র গঠন ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অপরদিকে ছিল হিন্দুত্বাদী শক্তির অধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বকারী সেকুলার মুসলিম নেতৃত্ব। তারা হিন্দু শাসনের অধীনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্ত্বাসন বা প্রাদেশিক প্রধান হওয়াকেই লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছিল। সেসময় থেকেই কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত আন্দোলনের পক্ষে মাওলানা হ্সাইন আহমদ মাদানী (রহিঃ) এর চিন্তাধারা আজও হিন্দুস্থানের মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও অনুসৃত। এ চিন্তাধারার অন্যতম নেতারা হচ্ছেন, কিফায়াতুল্লাহ দেহলবি রহ., সানাউল্লাহ অমৃতসরী রহ. প্রমুখ।

আর মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহিঃ)-এর মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা দিয়ে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সিংহভাগ উলামায়ে কেরাম এবং তাদের অনুসারীরা আজও প্রতাবিত। এ চিন্তাধারার অগ্রজদের মাঝে রয়েছেন, শার্বির আহমদ উসমানি রহ., মুফতি শফি রহ. প্রমুখ।

শাহ আব্দুল আজিজ ও সাইয়িদ আহমাদ শহিদদের সুযোগ্য উত্তরসূরীদের নের্তৃত্বে ১৮৫৭-তে ব্রিটিশবিরোধী সর্বব্যাপী বিপ্লব ঘটে। এরপর হিন্দুদের উক্ষানি ও ব্রিটিশদের চাপের মুখে উলামায়ে কেরাম ও মুসলিমদের জন্য এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যাপক জুলুম ও অত্যাচারের ফলে অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়। পুনরায় শক্তি সঞ্চয় এবং ফিকরী ও আসকারী ইদাদের লক্ষ্যে মুজাহিদ হাজী

ইমদাহুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি (রহিঃ)-এর আস্থাভাজন কাসিম নানূতভি (রহিঃ) ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম দেওবন্দ। কাসিম নানূতভি (রহিঃ), রশিদ আহমাদ গাংগুলী (রহিঃ) ও শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহিঃ) সালাফদের মানহাজের আলোকে ইলম, দাওয়াহ, ইস্তেকামাত ও সামরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামী শরিয়া ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। ভারতবর্ষের পাশে অবস্থিত আফগানিস্তান ও তুরস্কের মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে সামরিক অভিযানের আহ্বান জানানো এবং তাদের সাথে সমন্বয় করে ব্রিটিশরাজের পতন ঘটানোই ছিল শায়খুল হিন্দ এবং তাঁর সাথীদের পরিকল্পনা।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে অত্যাচারী শাসকদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে একই রকম কর্মতৎপরতার মাধ্যমে সফলতা লাভ করেছিলেন মিশর ও সিরিয়ায় মুসলিম নেতা ও আলেমগণ। যারা উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের সাথে যোগাযোগ করেন এবং উসমানীদের মিশরে প্রবেশের পর সহযোগিতার মাধ্যমে অত্যাচারী মামলুক শাসনের অবসান ঘটাতে কার্যকর ভূমিকা রাখেন।

একইভাবে ক্রুসেডারদের প্রতিহত করতে আন্দালুসের নেতাদের দ্বারা ইউসুফ বিন তাশফিন রহ.-এর সাহায্য গ্রহণের ইতিহাসও অজানা নয়। শায়খুল হিন্দ (রহিঃ) একই পন্থায় সফলতার ও কল্যাণের সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

কিন্তু এক পর্যায়ে উবাইহুল্লাহ সিন্ধী (রহিঃ) ব্রিটিশদের হাতে গ্রেফতার হয়ে যান এবং পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। এই আন্দোলনের নেতা শায়খুল হিন্দ (রাহিঃ) ও অন্যান্যদের গ্রেফতারপূর্বক মাল্টায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৯১৪ সালে ব্যর্থ হওয়া এই মহান পদক্ষেপটি ‘রেশমী রুমাল আন্দোলন’ নামে খ্যাত।

ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের কর্তৃত প্রতিষ্ঠাপিত হয় প্রবৃত্তিপ্রসূত সেকুয়লারিজম দ্বারা। অর্থাৎ, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে মানুষের উদ্ভাবিত আইন-কানুন দ্বারা। শাসক নির্বাচন, মপলিসি এবং সকলপ্রকার মতপার্থক্যের অবসান ঘটবে মানবীয় বুদ্ধির আলোকে। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের থাকবে না কোনো স্থান। ইউরোপে খ্রিস্টানদের জুলুম ও সীমালঙ্ঘন এই আত্মাতী সেকুয়লারিজমের আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তুলেছিল। কেননা মানুষ নিজ খ্রিস্তীয় অতীতের উপর হয়ে ওঠেছিল ত্যাক্ত-বিরক্ত!

কিন্তু, ভারতের মতো ভূমিতে কিভাবে সেকুয়লারিজম ও জাতীয়তাবাদী ধারণা জেঁকে বসলো!؟ এই ভূমির হিন্দ-মুসলিম সবাই জবরদখলকারী ‘ব্রিটিশ ইভিয়া’ নামক জাতিরাষ্ট্র ও ‘সাম্রাজ্যবাদী সেকুয়লার আইনসভা’ কে জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের কেন্দ্র মনে করত। তারা কিভাবে সেকুয়লারিজম ও ব্রিটিশ আইনসভাকে নিজেদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলো!؟ যে ভূমির মানুষজন ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইসলামী সমাজকে ন্যায় ও ইনসাফের যুগ সাব্যস্ত করত, তারা কেন পশ্চিমাদের অঙ্গ তাকলিদের রাস্তা বেছে নিল!?

কারণ হচ্ছে, ভারতীয় মুসলিমদের নেতৃত্বের আসন্নহীতাদের কেউ (আলিগড়ি সেকুয়লার) সচেতনভাবে, আবার কেউ অচেতন বা অবচেতনভাবেই (দেওবন্দি উলামাগণ) ইসলামের বিরুদ্ধে চরম আগ্রাসন হিসেবে পশ্চিম থেকে আগত আধুনিকতাবাদ বা লিবারালিজম নামক দীনের মূলনীতিগুলো মেনে নিয়েছিলেন।

যার দরুণ উপমহাদেশে ব্যাকি থেকে সমাজের সর্বস্তরে ইসলাম হয় নির্বাসিত। প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিমা সেকুয়লার দর্শন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ১৮৫৭-এর শামেলীর বিপ্লবী মুজাহিদীনদের উত্তরসূরিদের অনেকেই ব্রিটিশ-প্রভাবিত শিবিরের কিভাবে যোগ দিলেন?

শুধু যোগ দিয়েই তারা ক্ষান্ত হলেন না; বরং হিন্দু নের্ত্তাধীন কংগ্রেস এবং সেকুয়লার নের্ত্তাধীন মুসলিম লীগের আন্দোলনকে ফতোয়া, বক্তব্য, লেখালেখি এবং সাংগঠনিক সম্পত্তির মাধ্যমে বেগবান করে রাজনৈতিক আত্মহত্যার দিকে উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলিমদের ঠেলে দিলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদেরকে কংগ্রেসের মানহাজের অনুসারী মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ)-এর চিন্তাধারার ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ আলোচনা এখনো প্রাসঙ্গিক।

কেননা এই চিন্তাধারা আজও হিন্দুশাসিত ভারতে মুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও অনুসৃত।

আরো বুঝতে হবে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহি)-এর দাওয়াত ও নের্ত্তে মুসলিম লীগের তাকলিদের পেছনে ক্রিয়াশীল চিন্তাধারা। যে চিন্তাধারা দ্বারা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সিংহভাগ উলামায়ে কেরাম এবং তাদের কোটি কোটি অনুসারী আজও প্রভাবিত। কেবল তখনই উপলক্ষ্মি সন্তুষ্ট হবে যে, ‘আলীগড়ি সেকুয়লার’ মানস এবং উলামায়ে কেরামের ‘আধুনিক ইজতিহাদ’ একই সুতোয় গাথা!

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ওপর সামরিক-রাজনৈতিক ময়দানে প্রবল হওয়া ব্রিটিশরা, মুসলিমদের চিন্তার ময়দানেও প্রবল হয়ে যায়... হয়তো আজান্তেই, অগোচরেই!! যার দরুণ, বুদ্ধিভূক্তিক ও আত্মিকভাবে পরাজয় মেনে নেয়া ‘আলীগড়ি সেকুয়লার’নের্ত্ত ও ‘দেওবন্দি ইসলামী’ উলামাদের সম্মিলিত জোট ব্রিটিশপূর্ব ইসলামী সাম্রাজ্যের পরিবর্তে, আধুনিক পশ্চিমা ধাঁচের জাতিরাষ্ট্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করেন।

ভারতীয় তথা মুসলিমদের ঐক্য ও আনুগত্যের কেন্দ্রে ‘ইসলামী শরিয়াহ’র স্থান দখল করে নেয় ইউরোপিয়ান ‘জাতিরাষ্ট্র’। ফলত, শরিয়াহর শাসন নিশ্চিতের পরিবর্তে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়াকেই সাব্যস্ত করা হয় মূল লক্ষ্য।

ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ভারত থেকে জন্ম নেয় দুটি সেকুয়লার রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। শাসক ও আমলার গায়ের রঙ পরিবর্তন ছাড়া পাল্টালো আসলে না কিছুই!

১৯২০’এর দিকে গান্ধীর সাথে মিলে খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের সেকুয়লার রাজনীতিতে অস্তিত্বাত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এবং এক পর্যায়ে তা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রূপ নেয়। যা কি না হাজার বছরের ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা, তেহরিক ও রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারার সূচনা করে।

আর তুলনামূলক ক্ষুদ্র অংশটিতে মাওলানা থানবী ও মুফতি শফিদের (রহ.) স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সক্রিয় মেহনতের মাধ্যমে জিনাহ ও মুসলিম লীগের অধীনে পাকিস্তান নামক সেকুয়লারিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করে!

সন্তুর বছর পর, পশ্চিমা সভ্যতা আজ পতনের মুখে। উপমহাদেশের সীমান্তঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী ইমারাহ। এখন যদি উপস্থিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সময়কে বিপরীতে প্রবাহিত করতে হয়, যদি ইসলামকে উপমহাদেশে আবারো ফিরিয়ে আনতে হয়, তবে জানতে হবে কিভাবে সম্মান অপদস্থতায়, জ্ঞান মূর্খতায়, আমানতদারিতা (জেনে/না জেনে) থিয়ানতে রূপ নিয়েছিল।

ইসলাম ইসলাম ইসলাম।

১৯২০'এর দিকে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মাধ্যমে উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের সেক্যুলার রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তির সূচনা হয়। যা দীর্ঘ ৬০০ বছরের ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা ও রাজনীতির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারার সূচনা করে।

চরম ধূর্ত, লম্পট ও কপট নেতা মোহনদাস গান্ধীর সুচতুর কৌশল ও কথার মারপ্যাতে বিভ্রান্ত হয়ে, উলামায়ে কেরামের বড় একটি অংশ হিন্দুদের নেতৃত্ব মেনেই অখণ্ড ভারতের মেহনতে শামিল হন। কংগ্রেসের অধীনে মুসলিমদের একাত্ত করতে গঠন করা হয় ‘জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ’। এই সময়ে ব্রিটিশবিরোধী জিহাদি আন্দোলনের অগ্রসেনানী শায়খুল হিন্দ (রহ.), মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সহ নির্বাসন-ফেরত নেতাদের জন্য কংগ্রেস মুসাইতে সংবর্ধনারও আয়োজন করে।

গান্ধী-নেহরুরা মাদানী (রহ.)-কে বোঝাতে সক্ষম হয় যে, হিন্দুদের সাথে সম্প্রীতি ও ঐক্যের সম্পর্কের মাধ্যমে মুসলিমরা অধিকতর ধর্মীয় নিরাপত্তা লাভ করবে। ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে একই প্লাটফর্মে আন্দোলনকে মাদানী (রহ.) অপরিহার্য মনে করতেন।

তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন-

‘হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্যে অমুসলিমদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া শুধু জায়েয বললে চলবে বা বরং জরুরী হয়ে পড়েছে।’

(মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ২/১২৮, নাজিমুদ্দিন ইসলাহি)

১৯২০ সালে শাইখুল হিন্দ (রহ.) মৃত্যুবরণ করার পর দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান নিযুক্ত হন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)। ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে এই শিক্ষাপীঠটির ভূমিকা অনন্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। মাওলানা মাদানী (রহ.)-এর নেতৃত্বে মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র নির্বিশেষে হিন্দুদের নেতৃত্বে অখণ্ড ভারত কায়েমের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে কোমর বেঁধে নামে।

তারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে মস্তিষ্ক থেকে ছুঁড়ে ফেলে মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষা প্রকল্প সর্বপ্রথম উলামায়ে কেরামদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রসার ও প্রমাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)।

তিনি লিখেন,

‘একদিকে আল্লাহর দুশ্মনদের শাসন, অপরদিকে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যা মুসলিমদের বেষ্টন করে রেখেছে ফারাকটাও আবার মামুলি না। অমুসলিম পচাত্তর শতাংশ আর মুসলিমরা হল পঁচিশ শতাংশ। এই প্রকাশ্য ও ভেতরগত পার্থক্য ছাড়াও তাদের তথা অমুসলিমদের কামনা-বাসনা, আর শাসকগোষ্ঠীর ডিভাইড এভ রুলনীতি যে বিশ্বজ্ঞালা ও বিভেদ তৈরী করে রেখেছে যে—আল্লাহর পানাহ—এর উপর দারিদ্র্য, অভাব, ক্ষুধা, অন্তর্হীনতা ইত্যাদি মুসলমানদেরকে একেবারে অসহায় করে রেখেছে তা সত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম নিকট-অতীতে সশন্ত্রভাবে সফলতার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া আর কী ফলাফল আসলো?’

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ, মাওলানা ইসমাইল শহীদরা কি চেষ্টা করেননি? ১৮৫৭ তে হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা কাসিম নানুতুবি, মাওলানা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী কী করা বাকী রেখেছিলেন? কিন্তু ইতিবাচক ফলাফল আসলো না। ১৯১৪ সালে হযরত শাইখুল হিন্দ কী করেননি, কিন্তু ঘটানাটা কী ঘটল?

মুহতারাম, রাজনীতি শুধু দর্শন দিয়ে হয় না, বরং ইতিহাসও লাগে সাথে বাধ্যবাধকতা এই ‘আহওয়ানুল বালিয়াতাইন’ (দু বিপদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটা অবলম্বন করা) এর দিকে টেনে নিয়ে আসে এবং নিয়ে এসেছেও বটে ইসলামেও অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ত্রুকুম ও বিধান বদলে যায়া পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে ঢোখ বন্ধ করে থাকা ধ্বংস ও আত্মহত্যার শামিল।’

মাওলানা মাদানী ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের রাষ্ট্রচিন্তা এটাই ছিল যে, ব্রিটিশরাজের তুলনায় হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের অধীনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করা যাবে বেশি। উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের পর ইসলামী হৃকুমাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব, এমনটা তারা মনে করতেন না। মুসলিম সমাজের অবস্থার উন্নতি, ক্ষেত্রবিশেষে কিছু ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদির বাইরে কোন কিছুই অর্জনের পরিকল্পনা পরিলক্ষিত হয় না।

কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্যের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, হিন্দু-মুসলমানের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ব্যাপারে বৈধতা আদায়ে শায়খুল ইসলাম হস্তান আহমদ মাদানী (রহ.) বলেন,

‘এখন সময় এসেছে, বড় দুশ্মন (ইংরেজদের) থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করা। এদেরকে পরাজিত করার জন্যে হিন্দুদের সহযোগিতা নেয়াও দরকার। ইংরেজদের মধ্যে ছুত অস্পৃশ্যতার বাতিক না থাকলেও ওরা আমাদের জয়ন্য শক্ত। পক্ষান্তরে হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী। কাফের হলেও হিন্দুরা প্রতিবেশীর হক রাখে।’

(মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম ১/১৪৮, নাজিমুদ্দিন ইসলাহি)

১৯২০'এর দশকে গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিমদের সম্পত্তি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মাদানী (রহ.) ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে উপমহাদেশের স্বাধীনতাকামীদের প্রধান কর্তৃস্বর হয়ে ওঠে কংগ্রেস। পর্যায়ক্রমে হিন্দু-মুসলমান সকলেই কংগ্রেসকে স্বাধীনতা অর্জনের একক প্লাটফর্ম মনে করতে থাকে।

ହିନ୍ଦୁରେ ମୁସଲିମରେ ହିନ୍ଦୁରେ

୧୯୩୫ ସାଲେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରେ ବୃଟ୍ଟେନେର ଭାରତ ବିଷୟକ ପରରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଟେଗ୍ ଓ ଗଭର୍ନର ଜେନାରେଲ ଚେମସଫୋର୍ଡ । ଏଇ ଆଇନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଏକଟି ଫେଡାରେଲ ଶାସନ ବ୍ୟବହାଯ ପରିଣତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାଯ ଥାକିବେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ନର ଜେନାରେଲଦେର ହାତେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶେ (ସେମନ ବାଂଲା, ପାଞ୍ଜାବ, ଇଉପି, ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି) ଶାସନକର୍ତ୍ତ୍ଵ ବନ୍ଟନ କରା ହିଁ ବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରାଦେଶିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଦେର ହାତେ । ଏହି ସକଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଧାନଦେର ହାତେ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ କିଛୁ ବିଷୟେର କ୍ଷମତା ହେବେ ଦେଇଯା ହୁଏ । ଏହି ନିର୍ବାଚନେ ମୁସଲିମ ପ୍ରାର୍ଥୀଦେର କେବଳ ମୁସଲିମରାଇ ଭୋଟ ଦିତେ ପାରବେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଦେର କେବଳ ହିନ୍ଦୁରାଇ ଭୋଟ ଦିତେ ପାରବେ ବଲେଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୃହୀତ ହୁଏ ।

ଶାଭାବିକଭାବେଇ, ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ପ୍ରଦେଶଗୁଲୋତେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଶକ୍ତିର ନେତୃତ୍ୱାୟିନ କଂଗ୍ରେସ ବିଜ୍ୟ ଲାଭେର କୋନ ସନ୍ତୋଷବନାଇ ଛିଲନା । କିନ୍ତୁ ଜମିଯାତେ ଉଲାମାଯେ ହିନ୍ଦେର ଦାଓୟାତି-ସାଂଗଠନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ତୃତୀୟତାର ଫଳେ ୧୯୩୭ ସାଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ନିର୍ବାଚନେ କଂଗ୍ରେସ ଜୟଲାଭ କରେ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଗଠନର ସମର୍ଥ ହୁଏ ।

କଂଗ୍ରେସ ତଥା ହିନ୍ଦୁଦେର ଅଧୀନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତେ ମୁସଲିମରା ଆସଲେ କଟଟୁକୁ ନିରାପଦେ ଥାକତେ ପାରବେ, ତାର କିଛୁଟା ନମୁନା ଉପଲବ୍ଧି କରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ୧୯୩୭ ସାଲେ ସୀମିତ ପରିସରେ କ୍ଷମତା ଚର୍ଚାର ସୁଯୋଗକେଇ ନୀପିଡ଼ନେର ହାତିଆର ବାନାନୋ ହୁଏ ବ୍ୟାପକଭାବେ । ପଦେ ପଦେ ବଖିତ ମୁସଲିମରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକେ ପରିଣତ ହୁଏ । ସାଥେ ମୁସଲିମ ସେକ୍ୟୁଲାର ନେତୃତ୍ୱଦେର ପାଶାପାଶ ଉଲାମାଯେ କେରାମେର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେତୃତ୍ୱକେ ତୋଷାମୋଦ ଓ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନେର ଶର୍ତ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରତେ ନେହେରୁର କଂଗ୍ରେସ ଭୁଲ କରେନି ।

ମୁସଲିମଦେର ବ୍ୟାପାରେ କଂଗ୍ରେସେର ମୂଳ୍ୟାଯନେର ପ୍ରକୃତି ବାନ୍ତବତା ଫୁଟେ ଉଠେହେ ପ୍ରଥ୍ୟାତ କଥାସାହିତ୍ୟକ ଶର୍ତ୍ତୁଚନ୍ଦ୍ର ଚଟୋପାଧ୍ୟାଯେର ବଜ୍ରବ୍ୟେ ।

୧୯୨୬ ସାଲେ କଂଗ୍ରେସେର ବଙ୍ଗୀୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ମେଲନେ ଦେଇଯା ବକ୍ତ୍ଵାଯ ତିନି ବଲେଛେନ,

‘ହିନ୍ଦୁନ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁର ଦେଶ । ସୁତରାଏ ଏ ଦେଶକେ ଅଧୀନତାର ଶ୍ରଙ୍ଗଳ ହିଁତେ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏକା ହିନ୍ଦୁରାଇ । ମୁସଲମାନ ମୁଖ ଫିରାଇଯା ଆଛେ ତୁରକ ଓ ଆରବେର ଦିକେ—ଏ ଦେଶେ ଚିନ୍ତ ତାହାର ନାଇ ।... ଜଗତେ ଅନେକ ବନ୍ତ ଆଛେ ଯାହାକେ ତ୍ୟାଗ କରିଯାଇ ତବେ ପାଓଯା ଯାଯ । ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲମାନ ମିଳନେ ସେଇ ଜାତୀୟ ବନ୍ତ ।’

ଏତଦସତ୍ତ୍ୱେ, ଜମିଯାତ ଏବଂ ତାର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀଦେର ଅଧୀନେ ସଲ୍ପ ପରିସରେ କିଛୁ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧା ଓ ନାମେମାତ୍ର ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତାର ଆଶାତେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତେର ଆନ୍ଦୋଳନେ ସାମିଲ ଛିଲେନ । ଏବଂ ଏଥିନେ ଉନାଦେର ଉତ୍ତରସ୍ଥରିରା ଭାରତେ ପ୍ରାୟ ଏକଇ କର୍ମସୂଚିତେ ଆବଦ୍ଧ ରଯେଛେନ ।

ମାଦାନୀ (ରହ.) ଓ ଜମିଯାତେର ଗୃହୀତ ପଦ୍ଧତି ଓ ମାନହାଜେର ମୂଳ୍ୟାଯନେ ଆଶରାଫ ଆଲୀ ଥାନଭୀ (ରହ.)-ଏର ବିଶ୍ଵେଷଣ ଏଥାନେ ପ୍ରାସଞ୍ଜିକ ହୁଏ ।

ଥାନଭୀ (ରହ.) ଦେଖିବାରେ ପେଲେନ, ହିନ୍ଦୁଦେର ଆଶ୍ରା ଅର୍ଜନେର ନିମିତ୍ତ ମୁସଲିମଦେର ଗର୍ବ କୁରବାନୀ ଥିଲେ ବିରତ ଥାକତେ ଜମିଯାତେର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଫତୋଯା ପ୍ରଦାନ କରିଛେ । ତଥିନ ତିନି ବଲେନ,

‘আমাদের কর্মকৌশলতা তো এমন হওয়া উচিং যে, শরীয়তের কোন বরখেলাফের স্বপক্ষে যদি সারা দুনিয়ার সম্পদও বিছিয়ে দেয়া হয় তবে সম্পদের দিকে না তাকিয়ে শরীয়তের নির্দেশ পালনে অটল থাকা। সম্পদের প্রতি ভ্ৰক্ষেপ না কৱা।’

লাখ লাখ মুসলমান কুরবানীর যে সংস্কৃতি আত্মাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সামান্য রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে যদি ইসলামের এই মৌল প্রতীককে পরিহার করা হয় তাহলে ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা হবে। এমনটি করলে অমুসলিমদের কাছে একথাই প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের সব বিধিবিধানই এমন যে, কোনো না কোনো প্রেক্ষিতে তা ত্যাগ কৱা যায়।’

‘অসহযোগ’ ও ‘সত্যাগ্রহ’ আন্দোলন এবং পরবর্তী বিভিন্ন কর্মসূচিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের শীর্ষ নেতৃত্বের কংগ্রেস নেতা গান্ধীর অনুগমনের তীব্র সমালোচনা করে থানভী (রহ.) বলেন,

‘গান্ধী দুনিয়ার দাওয়াত দেয়; তাই যারা দুনিয়া-পূজারী তারাই তার দাওয়াতে হৃষি খেয়ে পড়ছে।’

‘গান্ধীর প্রতিটি কাজ ও কথায় একটি সুস্ক্র চাল থাকতো। সে ইংরেজ ও মুসলমানদের সব সময় নির্বোধ বানাতে চাইতো, বোঁকায় ফেলতে চাইতো। তার লক্ষ্য ছিল ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সবসময় সংঘর্ষ বাধিয়ে রাখা। এ কাজে সে ছিল খুবই পটু।’

ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে অপরিহার্য মনে কৱা এবং সেদিকে আপামৰ মুসলিম সাধারণকে আহবানের অসারতা আলোচনা করতে থানভী (রহ.) বলেন,

‘যৌক্তিক দৃষ্টিতে দেখলে তাতে মনে হয় এমতাবস্থায় এক্য স্থাপন সন্তুষ্ট কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেখতে হবে এ ধরনের ঐক্যে কারা লাভবান হয় আর ক্ষতি কাদের হয়। এ মুহূর্তেও যদি হিন্দু ও মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা এসে যায়, ত্তীয় পক্ষের কোন দখল না থাকে তাহলেও হিন্দুরাই লাভবান হবে। সাফল্য মুসলমানদের করায়ন্ত হবে না। এ কথা যুক্তির নিরিখে বলা চলে।

ওদের সংখ্যাধিক্যও এর একটি কারণ এবং ওদের স্বভাবই এমন যে ওদের সংস্পর্শে মুসলমানরা লাভবান হতে পারবে না। পক্ষান্তরে বিবেক ও বুদ্ধি একথা বলে যে, যদি ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সবাই সমান লাভবান হবে কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কখনও ন্যায় প্রতিষ্ঠা পাবে না। অতীত এর জুলন্ত সাক্ষী হিন্দুরা ভারতকে মুসলিম মুক্ত করতে সবসময়ই তৎপর। এরা ওদের স্বভাব থেকে কখনই বিরত থাকবে না। এদের কাজই হলো খুনাখুনী আর সুযোগ পেলেই মুসলিম নিধনে মেতে উঠা।’

(আল-ইফাদাতুল ইয়াউমিয়াহ, ৩/৩২৯-৩৩০)

কংগ্রেসে যোগদানের ক্ষেত্রে মাদানী (রহ.)-এর অবস্থানকে নাকচ করে দিয়ে থানভী (রহ.) বলেন,

‘কোনো মুসলমানের উচিত নয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়া।’ (দৈনিক ইন্কিলাব, লাহোর, ০৩/১২/১৯৩৭; পৃ. ০২)

১৯৩৯ সালে দিল্লিতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর কেন্দ্রীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে থানভী (রহ.)-কেও দাওয়াত করা হয়। মাওলানা সেই বৈঠকে উপস্থিত না হওয়ার ব্যাপারে দাওয়াতনামার অপর পিঠে যা লিখেছেন, কংগ্রেস সম্পর্কে এটাই তার মূল্যায়নের সারবস্ত। তিনি সেখানে কংগ্রেস সম্পর্কে তার তীব্র বিরোধিতার বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন। তিনি লিখেন,

‘বর্তমান পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে বাধ্য করেছে যে, এ মুহূর্তে উলামাদের কংগ্রেসে যুক্ত থাকা ধর্মের দিক থেকে খুবই ধ্বংসাত্মক। এর চেয়ে বরং কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা করা খুব জরুরী হয়ে পড়েছে। উলামাদের উচিত কোন মুসলিম সংগঠনে যোগ দেয়া। মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করা বা কাউকে যোগদানে উৎসাহিত করা আমার দৃষ্টিতে ধর্মীয়ভাবে অপমৃত্যুর শামিল।’

এই বিষয়টি বাস্তব যে, মুসলমানরা কংগ্রেসের যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তা ছিল একটি জনবিচ্ছিন্ন সংগঠন। মাওলানা থানভী (রাহিঃ) বহুবার তার মজলিসে নিজের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘মুসলমানদের অংশগ্রহণই ছিল জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্যতা হওয়ার প্রধান হাতিয়ার। হিন্দুদের দ্বারা গঠিত পঞ্চাশ বছরের কংগ্রেসকে মুসলমানরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবিত করে ফেলেছিল।’

নেহরু-গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সাথে মুসলিমদের সাময়িক সময়ের ঐক্যও যে ভয়াবহ তা উল্লেখ করে বলেন, ‘মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেয়ার অর্থ ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস টেনে আনা। মুসলমানদের কংগ্রেস করা, হিন্দুদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা কিংবা হিন্দুদেরকে মুসলমানদের সাথে মিশানো জাতি ও ধর্ম উভয়টির জন্যে ভয়ংকর ক্ষতির কারণ হবে।’

মাওলানা মাদানি রহ. -সহ জমিয়তের অন্যান্য উলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক চিত্তাধারার বিচ্যুতির ব্যাপারে মাওলানা থানভীর উপলক্ষ্মি ছিল—

‘হিন্দু ও কংগ্রেসীরা ইংরেজদের হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়নে আন্তরিক নয়। ওদের লক্ষ্য হলো ইংরেজদের সাথে দরকষাকষি করে নিজেদের জাতি ও ধর্মের বিজয়ডংকা বাজানো। কারণ কংগ্রেসী হিন্দুরা ভালভাবেই জানে, ইংরেজদের থাকাই তাদের জন্যে মঙ্গলজনক; ইংরেজদের চলে যাওয়ার মধ্যে তাদের বিপদের আশংকাও রয়েছে, না হলে ইংরেজদের উপস্থিতিতে এরা এতটা খুশহালে সরকারী কাজে যোগদান করতে পারত না।’

অপর এক মজলিসে কংগ্রেসী উলামাদের সংস্পর্শে তিনি বলেন,

‘তারা একথা বুঝতেই চান না যে, হিন্দুরা হিন্দুস্থান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চায় না। তারা চায় ইংরেজদের উপস্থিতিতে তাদের ধর্ম ও জাতীয়তার ভিত মজবুত করতে।’ (

ভারতবর্ষে হিন্দুবাদী শক্তি কংগ্রেসের ব্যাপারে খ্যাতিমান নেতা ডঃ আহেদকরও এই ঝঢ় বাস্তবতাকে স্বীকার করে লিখেছেন,

‘কংগ্রেস শক্তিশালী ও ব্যাপকতা হিন্দুদের দ্বারা পায়নি বরং তা মুসলিমদের অংশগ্রহণেই হয়েছে।’

পরিশেষে, হালের আরশাদ মাদানি, মাহমুদ মাদানি বা ফরিদউদ্দিন মাসউদদের যত সমালোচনাই করা হোক না কেন, বাস্তবতা এটাই যে- উলামায়ে দেওবন্দের একাংশের অনুসৃত অতিনমনীয় ও দ্রবীভূত মানহাজের ভিত্তি প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন স্বয়ং মাওলানা মাদানি (রহ.) ।

????????? ??????

হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) এর নের্ত্তে মুসলিমদের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে কংগ্রেস যখন অদম্য গতিতে অগ্রসরমান, তখন অপর সেকুলার জাতিয়তাবাদী গোষ্ঠী মুসলিম লীগও একই রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নেয়। আগাগোড়া সেকুলার ও পশ্চিমাপন্থী জিনাহ ও অন্যান্যরা মুসলিম লীগের সাথে দেওবন্দী উলামাদের বিশাল একটি অংশকে নিজেদের কর্মসূচির অধীনস্থ করে নেয়। আর এই অংশটির নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ।

হিন্দুদের অধীনস্থতা যেনে ব্রিটিশরাজের অবসানের পরিকল্পনার বিপরীতে- মুসলিম লীগের অধীনে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির সাথে একাত্ম ঘোষণা করেন মাওলানা থানভী (রহ.) ও তার অনুসারী উলামায়ে কেরাম। যাদের মাঝে ছিলেন মুফতি শফি (রহ.), মাওলানা শাবিব আহমেদ উসমানী রহমান (রহ.) প্রমুখ।

১৯৩৭ সালে এলাহাবাদ মুসলিম লীগ কমিটির সেক্রেটারির প্রশ়্নের জবাবে মাওলানা থানভী (রাহিঃ) বলেন,

‘আমার মতে প্রত্যেক ভারতীয় মুসলমানের মুসলিম লীগে যোগদান করা উচিত।’

(দৈনিক ইন্কিলাব, লাহোর, ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৭, পৃষ্ঠা ২)

ইংরেজদের ভাবশিষ্য নবাব ইসমাইল খানের বক্তব্যে প্রলুক্ত হয়ে মাওলানা থানভী (রহ.) মুসলিমলীগপন্থী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে সাইয়িদ হাসান রিয়াজ বলেন,

‘মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহিঃ) মুসলিম লীগের সভাপতিকে কতগুলো প্রশ্ন করলে; তখনকার ইউপি মুসলিম লীগের সভাপতি নওয়াব ইসমাইল খান যে জবাব দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হয়ে মাওলানা থানভী (রহ.) তার সাথে সংশ্লিষ্ট ও পরিচিত সবাইকে মুসলিম লীগকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। এর ফলে অসংখ্য বড় বড় আগেম মুসলিম লীগের

চেহারাটা পাল্টে দিয়েছিল।'

মুসলিম লীগ ও জিন্নাহর নেতৃত্বে বিশাল ভূখণ্ড হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে হলেও পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে মাওলানা থানভী বলেন,

‘মুসলমানদের উচিত মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টার ক্ষমতা না করা। কেননা হিন্দুস্থানে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিত করতে পারে একমাত্র মুসলিম লীগ।’

এক পর্যায়ে এসে মাওলানা থানভী প্রকাশ্যেই মুসলিম লীগের সহযোগিতা করতে শুরু করেন এবং নিজেই থানাভবন এলাকায় মুসলিম লীগের শাখা গঠনের নির্দেশ দিয়ে, মুসলিম লীগ সম্পর্কে তাঁর অবস্থানকে আরো পরিষ্কার করে দেন।

তবে মাওলানা থানভী রহ. মুসলিম লীগের ব্যাপারে আশঙ্কাও করেছিলেন

‘মুসলিম লীগ বিভিন্ন জমিদারদের দল। আমি জানি না, এরা ক্ষমতায় গেলে ইসলামী আইন চালু করবে কি না। যদিও কংগ্রেসের তুলনায় মুসলিম লীগ আমার কাছে ভাল মনে হয়, কিন্তু আমি সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না।’

কিন্তু ১৯৩৮ সালে বাসীর নির্বাচনী আসনে মুসলিম জয়লাভ করলে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি অনেকটা ঝুকে পড়েন। ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল থানাভবনে মুসলিম লীগের বিজয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অন্তত দশ হাজারের মতো মুসলমান সে সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিল। মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী সে সমাবেশে হ্যারত থানভীর পক্ষ থেকে বক্তৃতা পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন। থানভী রহ. সে বক্তৃতায় সশরীরে উপস্থিত না হওয়ার কারণ উল্লেখ করে লিখিত বক্তব্যে বলেন,

‘আমি সশরীরে সমাবেশে উপস্থিত থাকতে না পারলেও আপনাদের সাথে আছি, এবং মুসলিম লীগের সৎ ও ভাল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে একমত। আমি মুসলিম লীগের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্যে দু'আ করি। তিনি উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে। বলেন, সকল মুসলমানের উচিত্ব নিজেদের সাধ্যমত মুসলিম লীগের উন্নতি এবং শরয়ী দুর্বলতাগুলো সংশোধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

পরবর্তীতে পাটনা সম্মেলনে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আহ্বান জানিয়ে চিঠি লিখেন মাওলানা থানভী (রহ.)। তবে এই চিন্তা আশ্চর্যজনকভাবে কারো মাথায় এলো না যে, যারা নামাজই আদায় করে না, তারা কিভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখে!!

মাওলানা থানভী রাজনৈতিকভাবে ভারত স্বাধীনের ক্ষেত্রে জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের চিন্তার একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

জিন্নাহর প্রতি মাওলানা থানভী (রহ.)’র শ্রদ্ধাবোধ ও আঙ্গার প্রমাণ হিসেবে নিচের লেখাটি দেখা যেতে পারে-

‘স্বপ্ন আমি খুব কম দেখি, কিন্তু যখন দেখি তা বহুলাংশেই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। একবার আমি স্বপ্নে দেখলাম, ময়দানে হাশর অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কিছুসংখ্যক লোক আসনে উপবিষ্ট। তাদের সবাই উলামা ও সুলাহা।

କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖିଲେ ପେଲାମ ମିଷ୍ଟାର ଜିନ୍ନାହେ ଏକଟି ଆବା” ପରିହିତ ଅବଶ୍ୟା ତାଦେର ପାଶେଇ ଏକଟି କୁରସୀତେ ଉପବିଷ୍ଟ । ଆମାର ମନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଲୋ, ମିଷ୍ଟାର ଜିନ୍ନାହ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାଯେ କି ଭାବେ ଏଲେନ?

সাথে সাথেই এক বুঝুর্গ আমাকে বললেন, মিষ্টার জিন্নাহ বর্তমানে ইসলাম ও মুসলমানদের খুব সেবা করছেন, এজন্য তাকে এ সম্মান দেয়া হয়েছে । । ‘

(ହ୍ୟରତ ଥାନଭୀର ଏ ଉକ୍ତି କଲକାତାର ‘ଆସରେ ହାଜେର ‘ପତ୍ରିକାଯ ଛାପା ହେବିଲ ।)

A decorative horizontal border consisting of three rows of question marks enclosed in rectangular frames.

পৃথক ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়ে মুহাম্মদ আলী জিনাহ ও তার সেকুয়লার সহচরবৃন্দ মাওলানা থানভী (রহ.), মাওলানা শফি (রহ.)'দের প্রবক্ষিত করতে সক্ষম হলেও, এক্ষেত্রে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) ঠিকই তা বুঝতে পেরেছিলেন।

যে উদ্দেশ্যে মাওলানা থানভী (রাহিঃ) এবং উনার গুণগ্রাহী উলামায়ে কেরাম মুসলিম লীগ ও জিন্নাহকে শক্তিশালী করেছিলেন তা রদ করে তিনি বলেন,

“বর্তমানে পাকিস্তান আন্দোলন খুবই রমরমা। ‘পাকিস্তান’-এর অর্থ যদি হয়, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলায় ইসলামের বিধান ও রসূলের তরিকা মোতাবেক—হৃদুদ, কিসাস এবং অন্যান্য ইসলামি আইনের ভিত্তিতে—একটা ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন, তাহলে এইটা খুবই মহান কাজ, এর ব্যাপারে মুসলমানদের কোন অভিযোগ থাকা উচিত না। কিন্তু সত্য এই যে, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে, এইরকম কিছু হওয়ার সম্ভাবনা চিন্তাও করা যায় না।”

‘মাদানী ও মওদুদী: উপমহাদেশের দুই মনীষী কেন পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন?’ শৈর্ষক প্রবন্ধ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশ্লেষ পাওয়া যায়-

‘মাওলানা মাদানি একথা বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তান ‘ইসলামি রাষ্ট্র’ বলতে যা বোঝায় তার কিছুই হবে না। পাকিস্তান একটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সেকুলার রাষ্ট্র হবে।

মাওলানা মাদানি জিন্নাহর নানা মন্তব্য ('পাকিস্তান হবে ওয়েস্টার্ন ডেমোক্রেটিক কন্ট্রি' / শিল্প কারখানা সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রের মতই সরকারের হাতে থাকবে') কোট করে, তার ব্যক্তিগত জীবন ও অনুসৃত বহু নীতি কোট করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা'র ব্যাপারে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। 'ইসলামি শরিয়া' প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছা জিন্নাহর ছিল না, তার আধুনিক চিন্তাধারা এই 'শরিয়া' পালনও করত না।

তাহলে পাকিস্তান কী ছিল? পাকিস্তান ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষা ও বাংলার অত্যাচারিত মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিচয়ধারীদের গোত্রীয় মুক্তির আন্দোলন। এর সাথে ধর্মের সম্পর্ক ছিল কেবল পরিচয়ের খাতিরেই, শরিয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে না। মুসলমানদের রাষ্ট্র জিনাহর কাম্য ছিল, ইসলামি রাষ্ট্র না।

জিনাহর নানান দাবিদাওয়া নিয়ে দর কষাকষি করার একটা টোকেন ছিল পাকিস্তান। জিনাহর এমন জাতিবাদে মাদানির সায় ছিল না। তিনি ধরতে পেরেছিলেন, আর যা ঈ হোক, শরিয়া বা ইসলামি রাষ্ট্র জিনাহর লক্ষ্য না। তাই মুসলিম লীগের ‘ইসলামি’ রাষ্ট্রের ধারণার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগের ‘ইসলামবিরোধী’ কর্মকাণ্ডের একটা তালিকা হ্যাওবিল আকারে প্রচার করছিলো, যেগুলা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাষ্ট্র ও ক্ষমতার সাথে ইসলাম-প্রশ্নের মীমাংসা করা মুসলিম লীগের লক্ষ্য ছিল না, তাদের লক্ষ্য ছিল একটা মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্র গঠন।’

মাওলানা হসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) স্বীয় দূরদৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এবং সেকুয়লার মুসলিম লীগ আদতে ভিন্ন কিছু নয়। উভয় দলই মুসলিম জনগোষ্ঠীর বাসস্থান আর রুটি-রুজির বাইরে কোনো কিছুর সমাধান চায় না। উভয় পক্ষই চায় ধর্মনিরপেক্ষতা ও ব্রিটিশ আদলে গড়ে ওঠা শাসনক্ষমতার দখল। এজন্য প্রয়োজন কেবল মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন বা নিষ্ক্রিয়তা। অর্থাৎ, মাওলানা থানভি যেমন সুচারুভাবে মাওলানা মাদানির ভুলগুলো ধরতে পেরেছিলেন, একইভাবে- মাওলানা মাদানিও মাওলানা থানভির চিন্তাধারার বিচুতি সনাত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আফসোস শুধু এখানেই যে মাওলানা মাদানী (রহ.) ও মাওলানা থানভি (রহ.) পরস্পরের রাজনৈতিক চিন্তার দৈন্যদশার সঠিক পর্যালোচনায় উপনীত হলেও নিজেদের ক্ষেত্রে তা তলিয়ে দেখেননি। যার ফলে এখন অবধি মাওলানা থানভির চিন্তাধারা আঁকড়ে আছেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অসংখ্য দেওবন্দি উলামায়ে কেরাম ও রাজনৈতিক দল।

ঢাক্কাপত্র

উনবিংশ শতকের শেষভাগে শুরু হওয়া সেকুয়লারিজমের মোড়কে হাজির হওয়া বিকৃত ‘ইসলামপন্থা’ যে বাতিলপন্থীদের পাশাপাশি সরলমনা উলামায়ে কেরামদের মনকেও গ্রাস করে নিয়েছিল তার ঐতিহাসিক বাস্তবতা কিছুটা আলোচনা করা হল।

দাওয়াহ, ইদাদ ও বিপ্লবের নববী মানহাজ বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ‘ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন’ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলমানদের পক্ষে আসেনি মোটেও।

যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য মাদানী (রহিঃ) এর নেতৃত্বে অন্ত আর জিহাদ ছেড়ে মুসলমানরা কংগ্রেস অনুগামী হয়েছিল, তা এড়ানো যায়নি। হিন্দুরা কথা রাখেনি। মাদানী (রহিঃ)-এর চিন্তাধারাকে ভুল প্রমাণিত করে একের পর এক দাঙ্গায় পাইকারি হারে হিন্দুরা মুসলিমদের হত্যা করেছে। নিকট অতীত ও বর্তমাননেও কাশ্মীর, গুজরাট, ইউপি আর আসামে মাদানী (রহ.)-এর ‘প্রতিবেশী’

হিন্দুরা মুসলিম হত্যা ও নির্যাতনের ব্রিটিশদের অতিক্রম করেছে বহু আগেই।

যে রক্তপাত এড়ানোর জন্য মাওলানা থানভী (রহ.), মাওলানা শফী (রহ.)-দের আহবানে শত শত বছর ইসলামের অধীনে থাকা সুবিশাল ভূখণ্ড হিন্দুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানরা পাকিস্তান গঠন করেছিল, তা এড়ানো যায়নি। শুধুমাত্র স্থানান্তরের পথেই প্রাণ দিতে হয় ১০ লাখ মুসলমানের। স্থানান্তরিত হয় কেটির কাছাকাছি। ধর্ষিত হয় লক্ষাধিক নারী। এছাড়াও সম্মান বাঁচাতে কুয়ায় লাফিয়ে পড়ে অজস্র মুসলিম মা-বোন। আপন কথা রাখেনি জিন্নাহ বা মুসলিম লীগ। পাকিস্তানে একমুহূর্তের জন্যও শরীয়াহ প্রয়োগ হয়নি। শরীয়াহ শাসন আজো সুদূরপূর্বে আসছে।

এছাড়া মোটা দাগে একটি ভুল চিন্তা উভয়েই করেছেন। আর তা হলো- মাত্র দুইবারের ব্যার্থতাই উনাদের ইংরেজদের বেধে দেয়া ছকে ইসলামী আন্দোলনের অঙ্গে এক ‘ইজতিহাদ’ করতে বাধ্য করেছে!

১৮৫৭ ও ১৯১৪ তে মাত্র দুইবার পিছিয়ে পড়েই তাড়াভড়ো করে হাজী ইমদাদুল্লাহ’র মানহাজ পরিত্যাগ করে, সেক্যুলার রাজনীতি চর্চার অনুরন্ধরী ও স্কুল চিন্তাধারার ফলাফল আমরা আজ সচক্ষে দেখছি। ইংরেজ আমগের চেয়েও আজ উপমহাদেশের মুসলিমদের দীনি, দুনিয়াবী স্বাধীনতা বহুগুণ কম!

অথচ, ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াত দুটিকে সামনে রাখা উচিত ছিলঃ-

فَاصِرٌ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسْلِ وَ لَا تَسْتَعِجِلْ لَهُمْ

‘অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর আপনি তাদের জন্য তাড়াভড়ো করবেন না।’

فَاصِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لَا يَسْتَخْفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْقِنُونَ

‘অতএব আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য। আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।’

আল্লামা সাদী রহিমাহুল্লাহ আয়াতের তাফসিলে বলেন,

‘সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতেও লেগে থাকুন, তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহর ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই।

এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে। কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে

না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখি সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রঙ্গে করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়।

কারণ, তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের দৃঢ়তা কমে গেছে, তাই তাদের বিবেক হাঙ্কা হয়ে গেছে, তাদের সবর কমে গেছে। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আপনি যদি তাদের থেকে সাবধান না থাকুন, তবে তারা আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে, আপনাকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের উপর থেকে সরিয়ে দিতে পারে। কারণ, সাধারণত মন চায় তাদের মত হতে।

আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক মুমিনই দৃঢ়বিশ্বাসী, স্থির বিবেকসম্পন্ন, তাই তার জন্য ধৈর্য ধারণ করা সহজ। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দুর্বল ঈমানদার অস্ত্রিমতি থাকে।'

সাময়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েই পূর্বসূরীদের মানহাজ ত্যাগ করে, শক্তির বেধে দেয়া নিয়মে শক্তির মোকাবিলার বাস্তবতা ও শরিয়াহবিরোধী মানহাজ উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিমদের জন্য এক কলংকজনক অধ্যায়ই হয়ে রয়েছে বটে। কেননা, পরবর্তীতে গুণমুক্ত মুরিদান ও মুকান্নিদগণ এই ভুল মানহাজকেই আরো শক্ত করে আকড়ে ধরেন।

অথচ, তখনো সুভাষচন্দ্র বোস, সূর্য সেন, মানবেন্দ্রনাথ রায় বা মুজাফফর আহমদরা পর্যন্ত নিজ কর্মসূচী ত্যাগ করেনি। তারা ইংরেজদের নিমকখোর, প্রতিবিপুরী, সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ব্যাপারে সতর্ক দূরত্ব বজায় রেখেছে। সেখানে মুসলিমদের নেতা ও উলামারা পড়ি কি মরি করে মাসালিহে মুরসালাহর মোড়কে ইংরেজদের তাবেদার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গেজুড়বৃত্তিতে শামিল হয়েছিলেন! যে ধারা আজো বিদ্যমান নানা রূপে, আরো ব্যাপকভাবে!!

আফসোসের বিষয়, মাওলানা মাদানী (রহ.) ও মাওলানা থানভী (রহ.)'র 'শাস্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতি 'শরীয়াহ, বাস্তবতা ও ইতিহাসের মানদণ্ডে চরম ব্যর্থ, অদূরদর্শী ও নিষ্ফল প্রমাণিত হলেও; আজও অসংখ্য উলামায়ে কেরাম, তালিবে ইলম ও সাধারণ মুসলমান পূর্ববর্তীদের ভুলগুলো আঁকড়ে ধরে আছেন।

অথচ, উম্মতের উচিত ছিল উনাদেরকে সম্মানের স্থানে রেখেই ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া। অন্ধ তাকলিদকে আঁকড়ে ধরার মানহাজ মাওলানা থানবি রহ. বা মাওলানা মাদানি রহ. অনুসরণ করতেন না। বরং, উনারা 'সম্মান সম্মানের জায়গায়, আর হক হকের জায়গায় 'নীতির অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মূর্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

হ্যারত থানভী মাওলানা মাদানী সম্পর্কে বলেন,

'মাওলানা হুসাইন আহমদকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নির্ভেজাল ও বিশ্বস্ত মনে করি। দালিলিক কারণে আমি তার রাজনৈতিক চিন্তার বিরোধী। কিন্তু এই বাধা যদি দূর হয়ে যায় তবে আমি তার একজন নগণ্য সৈনিক হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত।'

বাস্তবতা হলো, মাওলানা মাদানী (রহ.) ও মাওলানা থানভী (রহ.)-সহ আমাদের অধিকাংশ সরলপ্রাণ উলামায়ে কেরামের জীবনের মৌলিক অংশ পার করে দেন ইলম, তাসাওউফ ও তাদরিসের ময়দানে। যার ফলে ক্রমপরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার (যেখানে ইসলাম ও মুসলমানরা ক্রমাগত চক্রান্তের শিকার) সঠিক ও সুষ্ঠু রাজনেতিক সচেতনতা অর্জনে দুর্বলতা চলে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। এক্ষেত্রে আমরা উনাদের অসম্মান করা বৈধ মনে করি না। তবে ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ ও মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে বাধ্য হয় ভুলকে চিহ্নিত করে থাকি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের বিশুদ্ধ আকৃতি ও নববী মানহাজের আলোকে উপমহাদেশে ইসলামী শাসন পুনঃউদ্বারের তওফিক দান করুন। আমীন ।।।